বেঙ্গল টাইমস

বিপর্যয়ের বাংলা

৬ এপ্রিল, ২০২৫

- দুর্নীতির দায় বিরোধীদের!
- রামনবমীর এত হিড়িক কেন?
- কলকাতার হৃদয়ে নাইট ব্রাত্য
- যাই যাই বসন্তে উত্তরে

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনি

একজনকে বাঁচাতে ২৮ হাজার কর্মহীন!

❑ অভিরূপ কুমার

রানী তোর কাপড় কোথায়!

❑ স্বরূপ গোস্বামী

সেই একই কুনাট্য চলছে

❑ মলয় রক্ষিৎ

অগত্যা সেই হিন্দুত্বের তাস

❑ ধীমান সাহা

বিনোদন

হাসতে তাদের মানা

❑ রক্তিম মিত্র

গল্প

অ–আ–ক–খ

❑ কুণাল দাশগুপ্ত

ওপেন ফোরাম

সরাসরি বিমান! অলীক কল্পনা

❑ অজয় কুমার

আহারে বাহারে

বিভূতিভূষণ এখানে কখনও খেতে আসেননি

❑ দিব্যেন্দু দে

খেলা

এতদিনে অ্যাস্ট্রো টার্ফ দিনের আলো দেখল

❑ সরল বিশ্বাস

কলকাতার হৃদয়ে ব্রাত্য নাইট

❑ অজয় নন্দী

ভ্রমণ

খোলা জিপ থেকে বাঘের গর্জন

❑ কুমকুম বসু দাস

পলাতক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

❑ শান্তনু দেশাই

কুয়াশা ঘেরা পাবং

❑ নূপুর রায়

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

আমরা কত নির্লিপ্ত!

বিপর্যয়টা হঠাৎ করে নেমে এল, এমন নয়। একটা পূর্বাভাস ছিলই। প্যানেল বাতিলের রায় দিয়েছিল হাইকোর্ট। সরকার গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সর্বোচ্চ আদালতও সেই একই রায় বহাল রাখল। কর্মহীন হলেন প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক। বাংলার বুকে এত বড় মাপের সরকারি দুর্নীতি কখনও প্রকাশ্যে আসেনি। নিছক কয়েকজন নেতা বা আমলা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। একেবারে উচ্চ প্রভাবশালীদের অনুমোদন ছাড়া এই মাপের দুর্নীতি হতে পারে না।

একসঙ্গে এত মানুষের জীবনে নেমে এল বিপর্যয়। কিন্তু এরপরেও সরকারের ভূমিকা সদর্থক নয়। সব দায় যেন বিরোধীদের।

যেন বিরোধীরাই এসএসসি চালাতেন। যেন বিরোধীরাই হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট চালাচ্ছেন। সবাই দায়ী, শুধু সরকারের কোনও দায় নেই। অদ্ভুত এক আঁধার। কীভাবে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়, আপাতত সেটাই গুরুত্ব পাওয়া উচিত। আইনি জট তো আছেই। কিন্তু তা ছাড়ানোর কি কোনও রাস্তা নেই! এত এত যোগ্য শিক্ষক, শুধুমাত্র সরকারের গোঁয়ার্তুমির কারণে তাঁদের এভাবে কর্মহীন হয়ে যেতে হবে? এমন সীমাহীন দুর্নীতি আর মিথ্যাচারের পরেও গর্জে উঠবে না বাংলা? গর্জে উঠবেন না সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ? আসলে, দুর্নীতিটা এতটাই গা সওয়া হয়ে গেছে, কোনওকিছুই আর রেখাপাত করে না। আমরা মেতে থাকব আইপিএলে, আমরা মেতে থাকব রামনবমীতে, আমরা মেতে থাকব সোশ্যাল মিডিয়ার চটুল রিলসে। এটাই আমাদের বর্তমান। এটাই আমাদের ভবিতব্য।

একজনকে বাঁচাতে ২৬ হাজার শিক্ষক কর্মহীন!

অভিরূপ কুমার

প্রথমেই বলে রাখি, আমি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত নই। হয়তো সেই যোগ্যতাও আমার নেই। তাই আমার চাকরি চলে গিয়েছে, এমন নয়। বা আমার আত্মীয়দের তালিকাতেও এমন কেউ নেই।

তবু হাইকোর্টের রায় মন থেকে মানতে পারছি না। এক ধাক্কায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাবে, এটা সত্যিই কাম্য নয়। হতে পারে, সবার হয়তো যোগ্যতার নিরিখে হয়নি। হয়তো অনেকের নম্বর কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকতে পারে। অনেকে হয়তো

পরীক্ষাতেই বসেননি, বা বসলেও সাদা খাতা জমা দিয়েছেন। তার মানে সবাই একেবারে অযোগ্য, এমনটাও নয়। হয়তো অন্যদের তুলনায় একটু কম যোগ্য। এমনও অনেকে আছেন, মোটামুটি যোগ্য, কিন্তু টাকা না দিলে চাকরি হবে না, এই চরম সত্যিটা বুঝে বাধ্য হয়ে টাকা দিতে হয়েছে।

সিবিআই, ইডি এতদিন ধরে তদন্ত করল। তারপরেও তাঁরা যোগ্য–অযোগ্যের তফাত করতে পারলেন না? তাহলে তাঁরা কতটা যোগ্য, তা নিয়েও তো প্রশ্ন থেকে যায়। ধরেই নিলাম, প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে। সরকার বা এসএসসি সময় নষ্ট করতে চাইবে, গুলিয়ে দিতে চাইবে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিকমতো তদন্ত হলে তারপরেও যোগ্য–অযোগ্য আলাদা করা সম্ভব ছিল। অন্তত চেষ্টাটুকু তো করা যেত। তা না করে মুড়ি–মিছরি এক করে দেওয়া হল।

একবার ভাবুন তো সেই যোগ্য চাকরি প্রাপকদের কথা। কে কোথায় অন্যায় করেছে বলে তাঁদের চাকরি চলে যাবে? শুধু তাই নয়, পাড়া–পড়শি, আত্মীয়–স্বজনও বাঁকা চোখে দেখবে। কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, তাঁর যোগ্যতার ভিত্তিতেই চাকরি হয়েছিল। তিনি টিউশড়ি পড়াতে চাইলে বাবা–মা তাঁদের ছেলেমেয়েকে তাঁর কাছে ভর্তিও করতে চাইবেন না। সত্যিই কি এমন শাস্তি, এমন মানসিক হেনস্থা তাঁর প্রাপ্য ছিল? সুপ্রিম কোর্ট রায় দেওয়ার আগে এই হাজার হাজার নির্দোষ শিক্ষকের কথা একবারও ভাবলেন না? যাঁরা চাকরি বাতিলের দাবিতে সওয়াল করলেন, তাঁরাও ভাবলেন না?

যাঁদের হয়তো নিয়ম মেনে হয়নি, তাঁরা হয়তো অনিয়মের সুযোগ নিয়েছেন, কিন্তু তাই বলে তাঁরাও আর যাই হোক, ক্রিমিনাল নন। তাঁদের চাকরি গেল, এটা তবু না হয় মেনে নেওয়া গেল। তাই বলে আট বছরের মাইনে ফেরত দেওয়া! তাও আবার বারো শতাংশ সুদ-সহ? এটা কারও পক্ষেই ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব? সত্যিই কি এতখানি শাস্তি তাঁদের প্রাপ্য?

আরজি কর কাণ্ডে তৎকালীন প্রধান বিচাপতি চন্দ্রচূড় সাহেব হতাশ করেছিলেন। কিন্তু চাকরি বাতিলের প্রশ্নে তাঁকে কিছুটা মানবিক বলেই মনে হয়েছিল। রাজ্য সরকারকে আড়াল করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি যোগ্য-অযোগ্য আলাদা করার ফের একবার সুযোগ দিয়েছিলেন। তাই সাময়িক স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন। মনে প্রাণে চেয়েছিলাম, এসএসসি যোগ্য-অযোগ্য তালিকা তৈরি করুক। যথাসময়ে আদালতে পেশ করুক। আর যেন কোনও জটিলতা তৈরি না হয়। এসএসসি যদি গড়িমসি করে, অন্তত সিবিআই যেন দুধ আর জল আলাদা করতে পারে।

এক কথায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু যাঁরা দিনের পর দিন হলফনামায় জানালেন, দুটো তালিকা আলাদা করা সম্ভব, তাঁদের কী হবে? যাঁরা দিনের পর দিন আদালতকে বিভ্রান্ত করলেন, সবার আগে দরকার ছিল তাঁদের হেফাজত নিশ্চিত করা। যাঁরা সব প্রমাণ নষ্ট করেছেন, তাঁদের কী শাস্তি দিল আদালত? তাঁদের অপরাধ নিয়ে তো কোনও সংশয় নেই!

আরও একটা কথা। অনেকে টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেই টাকা গেল কোথায়? আসল নাটের গুরু কে? সিবিআই নীরব কেন? আদালতই বা এই জায়গায় আলো ফেলছে না কেন? ধেড়ে ইঁদুরকে আর কতদিন আড়াল করা হবে? একটা ধেড়ে ইঁদুরকে বাঁচাতে গিয়ে ছাব্বিশ হাজার শিক্ষককে বলি দিতে হল।

একজন শিক্ষক এগিয়ে এসে বলুন, রানী তোর কাপড় কোথায়!

স্বরূপ গোস্বামী

বেশ কয়েকদিন আগের কথা। মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন লন্ডন সফরে। কেলগ কলেজের আমন্ত্রণে। সেখানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একদল প্রবাসী বাঙালিকে দেখা গেল, পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পেছন থেকে চিৎকার করছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে বাধা দিচ্ছেন।

সত্যিই বিষয়টি ভাল লাগেনি। মনে হয়েছিল, এটা শিষ্টাচার বিরোধী। আপনি মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিকভাবে বিরোধী হতেই পারেন, তাঁর সব কথা আপনার পছন্দ না হতেই পারে। কিন্তু সেখানে তিনি বাংলার প্রতিনিধি, দেশের প্রতিনিধি। সেখানে তিনি আমন্ত্রিত অতিথি। এভাবে তাঁকে বিক্ষোভ দেখানো বা তাঁর সভা পণ্ড করার চেষ্টাকে কিছুটা অশোভনীয়ই মনে হয়েছিল।

কিন্তু সোমবার নেতাজি ইনডোরে যদি এমন কোনও উদ্যোগ দেখি, মন থেকে সেই

বিক্ষোভকারীকে কুর্নিশ জানাব। চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স দেখছিলাম। এই বাংলায় পদলেহনকারির অভাব নেই। তাঁদের কেউ কেউ এরপরও তাঁকে মানবিক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রেস কনফারেন্স শোনার পর তাঁকে একজন মুখ্যমন্ত্রী ভাবতে কিছুটা লজ্জাই হচ্ছে। একজন প্রশাসক কতটা অপদার্থ হলে, একজন মানুষ কতখানি নিম্নরুচির হলে, এই জাতীয় প্রেস কনফারেন্স করতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সীমাহীন দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে। প্রমাণের ছড়াছড়ি। প্রমাণ লোপাটেরও ছড়াছড়ি। একের পর এক সরকারি দপ্তর ব্যস্ত সেই প্রমাণ লোপাটের খেলায়। আস্ত একটা ক্যাবিনেট নজিরবিহীনভাবে সেই কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দিতে চাইল। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী এমন ভান করছেন যেন তিনি কিছুই জানতেন না। যেন তাঁর সরকারের সমস্ত অপকর্মের দায় বিরোধীদের আর বিচারপতিদের। তিনি নাকি নেতাজি ইনডোরে চাকরি হারা শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁদের কথা শুনতে চান। সেই চাকরিহারা শিক্ষকদের কথা শোনার ক্ষমতা আছে? এত সৎসাহস আপনার আছে? কিছু পেটোয়া লোকজন থাকবে। তাঁরা আপনাদের শেখানো বুলি বলবে। আর তারপরই আপনি মাইক হাতে তুলে নিয়ে আবোল তাবোল বকে যাবেন। যেমন ঈদের মঞ্চ থেকে বলেন, যেমন সরকারি সভা থেকে বলেন, যেমন বইমেলার মঞ্চ বা ফিল্ম ফেস্টিভালের মঞ্চ থেকে বলেন।

আপনার সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির জন্য হাজার হাজার শিক্ষকের চাকরি গেল। আপনি একফোঁটাও অনুতপ্ত নন। উল্টে এরপরেও আপনি বিরোধীদের গালমন্দ করে যাচ্ছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে লোককে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। ইনডোরের সেই সভাতেও ঘৃণা ছড়াবেন। লন্ডনে পেটোয়া বাহিনীর দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। ইনডোরে কিন্তু থাকবেন চাকরি হারা শিক্ষকরা। অনেকেই অসহায়। অনেকেই এরপরেও আপনার ওপর ভরসা রাখতে চাইবেন। কিন্তু ওঁদের অধিকাংশই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, ওঁদের এই খাদের কিনারে টেনে আনার মূল নায়ক আপনার সরকার। তাঁরা কিন্তু বিক্ষোভ দেখাতেই পারে।

আপনার পুলিশ তখন কী করবে? এটা নিজের চেনা মাঠ। পুলিশ লেলিয়ে দিতেই পারেন। মিথ্যে মামলা দিতেই পারেন। ভবিষ্যতে যেন আর চাকরি না হয়, তা নিশ্চিত করতে পারেন। কিন্তু এরপরেও বিক্ষোভ হতে পারে। অন্য কোনও দলের প্ররোচনা দরকার নেই। তাঁদের মনের ভেতর যে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনই আগ্নেয়গিরি হয়ে লাভা বর্ষণ করতে পারে।

লন্ডনে সভা ভন্ডুলের চেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে আন্তরিকভাবেই চাই, আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকুক তীব্র ঘৃণা আর ধিক্কার। ঢোকার মুখেই যেন শুনতে হয়ে গো ব্যাক স্লোগান। চোর চোর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠুক নেতাজি ইনডোর। একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে এমন সম্ভাষণ হয়তো শোভনীয় নয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শোভনতা, শালীনতা প্রত্যাশা করার অধিকারটুকুও তাঁর নেই। এই ধিক্কারই তাঁর প্রাপ্য। খুঁজছি সেই শিশুকে, যে এসে চিৎকার করে বলবে, রানী, তোর কাপড় কোথায়!

সেই একই কুনাট্য চলছে

মলয় রক্ষিৎ

এই বিপর্যয় আসলে আজই নেমে এল, এমন তো নয়। প্রায় একদশক ধরে রাস্তায় ফুটপাতে বসে থাকা চাকরি প্রার্থীদের আর্ত স্বর আমরা এতদিন শুনেও না শোনার ভান করেছি। হাইকোর্টের এজলাসে দুর্নীতির দায়ে হাড় কঙ্কাল বের হওয়া পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তরের নাঙ্গা রূপ দেখেও চুপ থেকেছি। এসএসসি হোক বা পিএসসি, কিংবা কলেজ সার্ভিস কমিশন—বিগত কয়েক বছরে এই অফিসগুলোতে চাকরি নিয়ে দুর্নীতি আর কারচুপির ঘটনাগুলো যতবার সামনে এসেছে, আমরা রাগে ঘৃণায় কেউ-ই কিন্তু ফেটে পড়িনি।

আইন আইনের পথে চলবে–এই লব্জ মনে রেখে আদালতের উপরেই যেন ছেড়ে দিয়েছিলাম বিচারের ভার। ফলে, এই রায়ে আমরা আজ বেদনাহত হলেও বিস্মিত নই। ভাবছি দুর্নীতি কিছু তো হতেই পারে, কিন্তু তাই বলে এরকম রায়? যেন যাবতীয় দোষ আদালতের, শিক্ষা দপ্তরের নয়।

আদালত একবারও প্রশ্ন তোলেন না, মন্ত্রিসভার সেই সব কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে, যাঁরা যোগ্য আর অযোগ্য আলাদা করতে চাইলেন না। যাঁরা নানা উপায়ে চেষ্টা করলেন যাতে অযোগ্যদের কিছুতেই নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত না করা যায়, যাতে দুর্নীতির চিহ্নগুলো মুছে ফেলা যায়। বিচারপতিরা দুর্নীতির সেইসব দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের রায়ে বিশদে উল্লেখও করেছেন। অথচ যাঁদের নেতৃত্বে এই দুর্নীতি সম্ভব হল, সেইসব মন্ত্রী, আমলা, কমিশন-আধিকারিক এবং কর্মচারীদের বরখাস্ত করা কিংবা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা তাঁরা একবারও বললেন না।

কেন বললেন না? কেন না, আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে তো কোনও মামলা হয়নি। সুতরাং আইন আইনের পথে চলবে, দুর্নীতির কারিগরেরা নিরাপদে থাকবেন। অসৎ আর অযোগ্যদের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ধ হবেন হাজার হাজার যোগ্যরাও। আমি নিশ্চিত, শাসক এই রায়ই চেয়েছিলেন। তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে, রায় এটাই হতে যাচ্ছে। তাই আদালত যতই বলুক, অযোগ্যদের ঠিকঠাক চিহ্নিত করবার দায় তাঁরা নেয়নি। শাসক ভাল করেই জানেন, এ রাজ্যে শিক্ষক আর সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবধান আজ পর্বতপ্রমাণ। শিক্ষক সম্প্রদায়ের ওপর ন্যূনতম কোনও সমর্থন কিংবা সহানুভূতি সাধারণ মানুষের নেই। এবং এটাই শাসকের অস্ত্র। তাঁরা ভোটারদের এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, পড়াশোনা করে কিছু হয় না। বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, ঘুষ না দিয়ে চাকরি পাওয়া যায় না। যে কোনও চাকরিই আসলে ঘুষ অথবা আনুগত্যের বিনিময়ে পাইয়ে দেওয়ার ফল। ফলে যোগ্যতা নয়, সফলতার উপায় মাত্র দুটি, আনুগত্য অথবা ঘুষ।

আদালতের এই রায়ে যোগ্য এবং অযোগ্য

নির্বিশেষে যাঁদের চাকরি খোয়া গেল, আমি জানি তাঁদের অনেকে এই রায়কে 'ভাগ্যের মার' বলেই ধরে নেবেন। তাঁরা যে আস্তিক্যবাদী। তাঁরা ঈশ্বরের 'লীলা'য় বিশ্বাস করেন। তাই যে-কোনও বিপর্যয়কেই তাঁরা ঐশ্বরিক লীলা বলে ভাবতে পারেন, তাঁদের পক্ষে সেটা ভাবা সমুচিতও। ফলে তাঁরা কি রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে যাবেন? শাসকের কাছে এই ধার্মিকদের মূল্য সবসময়ই বেশি। ধর্মের প্রতি আনুগত্যই হোক বা শাসকের প্রতি আনুগত্য– আমার কাছে তা হল একই পয়সার এপিঠ–ওপিঠ।

যাঁরা ঘুষ দিয়ে অসৎ উপায়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁরা কেউই কিন্তু রাগে ফেটে পড়ছেন না। কাদের তাঁরা ঘুষ দিয়েছিলেন, কোন কোন দালাল/নেতার কথায় তাঁরা ভরসা পেয়েছিলেন, তাঁদের নাম কেউ সামনে আনছেন না। রাস্তায় নেমে এসে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস বোধহয় এ রাজ্যের চাকরি প্রার্থীদের নেই। আপাতত তাঁরা প্রতিবেশী বিহারের আসন্ন স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার দিকে তাকিয়ে আছেন। কেউ কেউ এই বিপর্যয়ের দায়ভাগে কে বা কারা আছেন, হিসেব করছেন। কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করে নিজেরও দায় খুঁজছেন।

এদিকে আরও অজস্র মামলা ঝুলে আছে। কলেজ সার্ভিস কমিশন আদালতে গা জোয়ারি করে আবারও বলবেন, মেরিট লিস্টে প্রার্থীদের কীসে কত নম্বর দেওয়া হয়েছে তার ডিটেলস দেখাব না। ইন্টারভিউর ভিডিওগ্রাফি করব না। স্কুল সার্ভিস কমিশন বলবেন, প্রার্থীদের উত্তরপত্রের ডুপ্লিকেট দেব না, ডিটেলস নম্বর আপলোড করব না। আদালতে লাল-সবুজের দড়ি টানাটানি খেলা চলবে। আদালত দুরন্ত শাসকের আবদার আবারও বার বার মেনে নেবেন। আবারও ঘটা করে চাকরির অ্যাড বেরোবে। সিভিক ভলান্টিয়ার ও পার্টি স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষাকেন্দ্রের সম্মুখে জলসত্র ক্যাম্প বসবে। এবং যথারীতি সরকারের ছত্রিশ মাসেও বছর শেষ হবে না। আবারও অনুদান প্রত্যাশী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় ভীড় বাড়বে। কিচ্ছু করার নেই বলে তাঁরা পিএইচডি করার লাইনে গিয়ে দাঁড়াবে। এক দশকের বেশি সময় ধরে এইসব চিত্রনাট্যই দেখে আসছি।

সিবিআইয়ে তীব্র অনাস্থা, অগত্যা সেই হিন্দুত্বের তাস

ধীমান সাহা

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা খুব চিন্তায়। শুভেন্দু অধিকারী এত হিন্দু হিন্দু করছেন কেন? কথায় কথায় হিন্দু-মুসলিম তাস খেলছেন কেন? যেখানে যাই ঘটুক, তার পেছনে এমন উস্কানিমূলক মন্তব্য করছেন কেন?

বছর দুই তিন আগেও তো তিনি এমন সুরে কথা বলতেন না। বিজেপি করতে গেলে যেটুকু বলতে হয়, সেটুকুই বলতেন। তখনও হুঙ্কার দিতেন। কিন্তু তাতে এত 'হিন্দু-মুসলমান' থাকত না। মনে করে দেখুন, বছর দুই আগের কথা। তিনি হুঙ্কার ঝাড়লেন, পুজোর আগেই কিছু একটা

হতে চলেছে। কিছুই হল না। এবার এলেন ডিসেম্বর ধামাকায়। ডিসেম্বরের মধ্যেই নাকি বড় সড় একটা ধামাকা হতে চলেছে। আসলে, দিল্লির নেতাদের আশ্বাসে তাঁর মনে হয়েছিল, দিল্লি বুঝি নড়েচড়ে বসেছে। কিন্তু তাঁরা যে নিজেদের রাজনৈতিক অঙ্কটুকুই বোঝেন, তাঁরা যে শুধু নিজেদের ক্ষমতায় থাকাটুকুই নিশ্চিত করতে চান, এই সহজ সত্যিটা শুভেন্দু সত্যিই বোঝেননি। বুঝলেন, অনেক দেরিতে। যখন ডিসেম্বরটা জানুয়ারি হয়ে গেল। জানুয়ারিটা ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল। আস্তে আস্তে সেপ্টেম্বর হাজির হয়ে গেল। সেই পুজো থেকে অন্য পুজো হাজির হয়ে গেল।

দিলীপ ঘোষ অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন, সিবিআই বা ইডি আসল কাজের কাজ কিছুই করবে না। তিনি অনেক আগে থেকেই বুঝে গিয়েছিলেন, এই দুই তদন্তকারী সংস্থার হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। কারা বেঁধে রেখেছেন, কেন বেঁধে রেখেছেন, তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তিনি বুঝেছিলেন, দিল্লির নেতৃত্ব এই রাজ্য থেকে কখনই তৃণমূলকে সরাতে চায় না। তৃণমূলকে রেখে দিতে পারলেই তাঁদের লাভ। তাই, তৃণমূলকে অক্সিজেন দিয়ে টিকিয়ে রাখতে যা যা করার দরকার, মোদি-অমিত শাহরা তাই তাই করবেন। দিলীপ ঘোষ শুরুতে দলের মধ্যে উষ্মা প্রকাশ করতেন। পরের দিকে বাইরেও বলে ফেলেছেন। সেই কারণেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সেই কারণেই বারবার তাঁর মুখ বন্ধ করতে নানা ফতোয়া এসেছে। এমনকী ভোটের মুখে হঠাৎ করে তাঁর কেন্দ্র বদল কেন, সেটাও এতদিনে পরিষ্কার। স্বয়ং দিলীপ ঘোষও প্রকাশ্যে বারবার বলেই ফেলেছেন।

অর্থাৎ, দিলীপ ঘোষ যেটা অনেক আগে বুঝেছেন, শুভেন্দু এতদিনে বুঝছেন। তিনি ভেবেছিলেন, তিনি দিল্লিতে গিয়ে নালিশ ঠুকবেন, আর অমিত শাহ সিবিআই-কে লেলিয়ে দেবেন। কিন্তু তা যে হওয়ার নয়, এটা বুঝতে অনেক সময় লেগে

গেল। দিল্লির নেতাদের কাছে রাজ্য বিজেপির চেয়ে তৃণমূল অনেক বেশি প্রিয়, এটা বেশ বুঝেছেন। সিবিআই, ইডির ওপর ভরসা করতে গেলে বারবার ডুবতে হবে, হাঁসির খোরাক হতে হবে, অভিজ্ঞতা তাঁকে এটুকু অন্তত শিখিয়েছে। তাই ভুলেও আর সিবিআই, ইডির ভরসায় কোনও হুঙ্কার ছাড়েন না। এখন একটাই তাস, হিন্দুত্ব। অন্তত এই প্রচারটা মানুষ কিছুটা হলেও নিচ্ছে, এটুকু বুঝেছেন।

শুভেন্দুর জায়গায় অন্য কেউ হলে ঝাঁকের কই এতদিনে দিব্যি ঝাঁকে মিশে যেত। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন বলে বিজেপিতে এসেছিলেন। এসে বুঝলেন, দিল্লির নেতারা তৃণমূলকে অক্সিজেন দিতেই বেশি ব্যস্ত। কেন্দ্রীয় এজেন্সি প্রমাণ জোগাড় করার থেকে প্রমাণ লোপাট করায় বেশি ব্যস্ত। এখন কী করবেন? অন্যরা আবার পুরনো দলে ফিরে গেলেও তাঁর সে উপায় নেই। তিনি জননেতা, মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বিজেপিতে গেছেন। তাই তাঁর হতাশ হওয়ার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পাশে নেই বুঝেও তাঁকে হুঙ্কার দিয়ে যেতেই হবে।

কিন্তু সেই হুঙ্কার কীসের ভরসায়? এটুকু বুঝেছেন, সিবিআই বা ইডির ভরসায় কোনও হুঙ্কার চলবে না। কাজেই ‘হিন্দুত্ব’ ছাড়া আর উপায় কী? এই হিন্দুত্বের আস্ফালনে কতখানি সাম্প্রদায়িক ইন্ধন আছে জানা নেই। যা আছে, তা হল সিবিআই, ইডির প্রতি তীব্র অনাস্থা।

হাসতে তাদের মানা

রক্তিম মিত্র

কুণাল কামরা। নামটা প্রথম শুনি বেশ কয়েক বছর আগে। যখন তিনি বিমানে অর্ণব গোস্বামীকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন। কুণাল একজন স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান। অনেককেই মিমিক্রি করেন। কিন্তু তাঁর এই আচরণ সমর্থনযোগ্য ছিল না। তিনি নিজের স্টুডিওতে অর্ণবকে নিয়ে আলাদা করে গান বাঁধতেই পারতেন। কিন্তু বিমানের মাঝে যা করেছেন, তা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু অর্ণব গোস্বামী আবার চিৎকার করতে সিদ্ধহস্ত। অন্যের কথা শোনার ধৈর্য তাঁর নেই। তিনি মনে করেন, তিনি একাই চিৎকার করে যাবেন। সেটাই বাকিদের শুনে যেতে হবে। এ হেন অর্ণব যে চুপচাপ থাকার পাত্র নন, তা বোঝাই গিয়েছিল। ফল কী হল! একের পর বিমান সংস্থা কুণালের বিমান ভ্রমণেই নিষেধাজ্ঞা জারি করল। যে বিমানে তিনি এমন আচরণ করেছিলেন, তারা নিষেধাজ্ঞা জারি করলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু অন্যান্য সংস্থাগুলিও যেভাবে উপযাচক হয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি শুরু করলেন, তা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়।

যাই হোক, আবার শিরোনামে সেই কুণাল। তিনি মাস দুই আগে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে একনাথ শিন্ডে নিয়ে কিছু কটাক্ষ ছিল। যদিও সরাসরি নাম করেননি, কিন্তু যাঁরা বোঝার, বুঝতে পারবেন, লক্ষ্য কে। মোদিকে নিয়েও তাঁর প্যারোডি ছিল। প্যারোডির পাল্টা প্যারোডি হতেই পারত। তাছাড়া, শাসক হতে গেলে কিছু সহিষ্ণুতা থাকাটাও জরুরি। কুণাল এমন কিছুই শব্দ ব্যবহার করেননি, যা শালীনতার সীমার

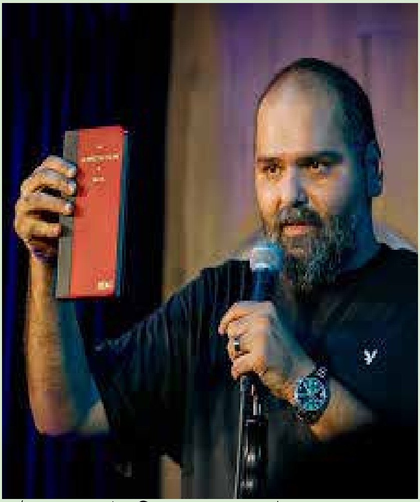

বাইরে। রাজনৈতিক মঞ্চে এমনটা তো আখছার হয়ে থাকে। টিভি চ্যানেলের বিতর্কেও এর থেকে অনেক নিম্নমানের ভাষায় তর্কাতর্কি চলে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দেন, তা অনেক সময়ই এর থেকে নিম্নমানের। এখানে তবু হাস্যরস আছে, বুদ্ধিমত্তা আছে, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সেটুকুও থাকে না।

ফল কী হল! একদল ভাঙচুর চালালেন স্টুডিওতে। দু মাস আগে যে স্টুডিওতে রেকর্ডিং হয়েছিল, সেই স্টুডিওতে বীরদর্পে ভাঙচুর চালাল একদল জনতা। স্বয়ং একনাথ শিন্ডে কী বললেন? তিনি আউড়ে বসলেন নিউটনের তৃতীয় সূত্র। অর্থাৎ, ক্রিয়া হলে প্রতিক্রিয়াও হবে। কোনটা ক্রিয়া আর কোনটা প্রতিক্রিয়া? কমেডিটা ক্রিয়া আর ভাঙচুরটা হল প্রতিক্রিয়া? এই মানুষটি কয়েকমাস আগেও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন? এই মানুষটি এখনও উপ মুখ্যমন্ত্রী?

তিনি দল বদল করতেই পারেন। যে দল তাঁকে পরিচিতি দিল, তাকে ছেড়ে আসতেই পারেন। কিন্তু বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করার নৈতিকতাটুকুও দেখাননি। কোনও নৈতিকতা বা আদর্শের টানে নয়, স্রেফ ক্ষমতার জন্যই শিবির বদল করেছিলেন। এই লোককে ‘গদ্দার’ বললে খুব কি অন্যায় হয়ে যায়! ভাঙচুরের অধিকার জন্মে যায়!

আসলে, শিন্ডের মতো লোকেরা দল ভাঙিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা উপ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যান ঠিকই, কিন্তু এই চেয়ারের ওজন বোঝেন না। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার তাঁকে আর সেই পদ দিল না বিজেপি। করা হল উপ মুখ্যমন্ত্রী। ন্যূনতম আত্মসম্মান থাকলে এই পদটা নিতেন না। অন্তত বালাসাহেব ঠাকরে কোনও দিন মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে চাননি। যাই হোক, একনাথ শিন্ডের অনুগামীরা হোটেলে ঢুকে এভাবে ভাঙচুর চালানোর সাহস পেলেন কোত্থেকে? আসলে, তাঁরা জানেন, পুলিশ কিছুই করবে না। থাপ্পড়টা তাহলে কার গালে পড়ল? পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতি এমন অনাস্থা তো তাঁরাই জানালেন।

সেই সঙ্গে তাঁরা এটাও জানেন, কেন্দ্রের দিক থেকেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। মোদিকে ব্যঙ্গ করেছেন, অতএব ভাঙচুর বৈধ, এই আনন্দে কেন্দ্রীয় সরকারও হাত গুটিয়েই থাকবে। অর্থাৎ, কেন্দ্রের সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরাও এই গুন্ডামি আটকাতে কিছুই করবে না। উল্টে তাঁদের আড়াল করবে। পুরস্কৃত করবে। আর কুণাল কামরাকে নানাভাবে হেনস্থা করবে। সত্যিই, প্রধানমন্ত্রীর অপদার্থতার ওপর তাঁর দলের লোকের কতখানি আস্থা!

অ-আ-ক-খ

কুণাল দাশগুপ্ত

জীবনের যত কোলাহল সব অ্যালকোহলেই খুঁজে পেত সবুজ। কাব্য করে বলত, কত সন্ধ্যা রঙিন হয় লাল রঙের এই জলে, কত গ্লাসের গায়ে জমে কত আবেগের বিন্দু।

এই বিলাসিতাকে এক ইঞ্চিও প্রশ্রয় দিতে চায়নি তার চাকরিরতা স্ত্রী অনসূয়া। অশান্তির বর্ষা অমঙ্গল ডেকে আনত প্রতি রাতে। নিয়ম করে।

দূরত্ব ছিল আরও একটা বিষয়েও। রাজনীতি। সবুজের বাম বিরোধিতা ছিল অকৃত্রিম। সর্বহারা, শ্রেণিহীন সমাজ জাতীয় শব্দগুলো গা জ্বলিয়ে দিত তার। উল্টোদিকে অনসূয়া বাম কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মিটিং, মিছিল তার কাছে সঙ্গীতশিল্পীর গলা সাধার মতো নিত্য দিনের কাজ।

অশান্তি, ঝগড়ার অন্তাক্ষরী চলার সময়ে কখনও কখনও অনসূয়ার অ-আ-ক-খ সিরিজের বাম বইগুলো ছুঁড়ে ফেলেছে। অশালীন শব্দ প্রয়োগ করে সমাজতন্ত্রের অসারতার কথাও বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে চৌত্রিশ বছরের বাম রাজত্ব রাজ্যকে

সাড়ে বত্রিশভাজা করেছে। অনসূয়াও বলেছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ক্ষুদ্র শিল্প, ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত, কৃষিতে এই রাজ্যটাই এগিয়েছিল। আসলে, বাম বিরোধিতা করতে গেলে লেখাপড়া না করলেও চলে। কিন্তু সমর্থন করতে গেলে একটু আধটু পড়তে হয়। তোমার বিজ্ঞান জ্যোতিষ আর জড়িবুটি। আমার বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

সবুজ লম্বা। ছিপছিপে। বেসরকারি কোম্পানির মার্কেটিং বিভাগের জিএম। বৈভবের চিলেকোঠায় বসে রয়েছে।

আরও একটা গুন রয়েছে। মেয়েদের মনকে প্রভাবিত করতে পারে 'ঘরে-বাইরে'র সন্দীপের মতোই। সুতপার মনে হানাদারি চালিয়েছে একেবারে এক্কেবারে সবুজীয় কায়দায়। শরীর-মন দুটোই মাখামাখি করেছে দুজনে। পার্ক স্ট্রিটের হোটেলগুলো প্রতি সন্ধ্যায় সত্যযুগের বৃন্দাবন হয়ে যেত। প্রাচ্যের আরব্য রজনী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অন্যদিকে, অনসূয়া মন দিয়েছিল রাজনীতি আর তাদের দশ বছরের ছেলে অনীকের লেখা পড়ার বিষয়ে। আসলে, কাটখোট্টা রাজনীতির পাশাপাশি সংসারে শান্তির ফুল ফোটানোরও একটা স্বপ্ন ছিল তার। অফিস, রাজনীতি আর ছেলে মানুষ করাই ছিল অনসূয়ার জীবনের সিম্ফনি।

সুর ছিটকালো, যখন জানতে পারল

সবুজ-সুতপার ব্যকরণ বহির্ভুত সম্পর্কের কথা। সেদিনই হৃদয়ের ঝাঁপ ফেলে দেয় সে। তারপর একদিন সরকারি তালা। ডিভোর্স হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে পচন ধরে সবুজ-সুতপার কৃত্রিম প্রেমে। সবুজও বুঝতে পারে, বউ আর 'বউয়ের মতো'র মধ্যেকার ফারাকটা।

অতিরিক্ত মদের ফলে বিবর্ণ হয়েগিয়েছিল সবুজের স্নায়ুগুচ্ছ। অবসাদ আর অপরাধবোধ পিশাচের নৃত্য চালিয়ে যায় মনের মধ্যে। বুঝতে পারে সর্বহারা কাকে বলে।

বড্ড মনে পড়েছে অনসূয়ার কথা। অতঃপর কড়া নাড়ে প্রাক্তন হয়ে যাওয়া শ্বশুরবাড়ির দড়জায়। শীর্ণকায় সবুজ অনসূয়াকে বলে, শেখাবে একটু বাম রাজনীতির অ-আ-ক-খ?

এতদিনে অ্যাস্ট্রো টার্ফ দিনের আলো দেখল!

সরল বিশ্বাস

পৃথিবীর প্রাচীনতম হকি প্রতিযোগিতা কোনটি? উত্তর হল, বেটন কাপ। কোথায় হয়? উত্তর হল, কলকাতা। হ্যাঁ, হকির ইতিহাসের সঙ্গে এভাবেই জড়িয়ে আছে কলকাতার নাম। দেশের দিকপাল তারকারা খেলে গেছেন এই বেটন কাপে। এখন বেটন কাপ আছে ঠিকই, কিন্তু সেই উন্মাদনা আর নেই। কবে শুরু হয়, কবে শেষ হয়, জানাই যায় না।

প্রতি বছর বেটন কাপ এলেই একটি আশ্বাস ঠিক শোনা যেত। ফাইনালে হাজির থাকতেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলতেন, আমরা অ্যাস্ট্রো টার্ফ তৈরি করছি। সামনের বার থেকে বেটন কাপ হবে সেই নতুন অ্যাস্ট্রো টার্ফে। এক দশকের বেশি সময় ধরে এই ভাঙা

রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন। কাগজে সেই ভাষণ বড় বড় করে বেরিয়েছে, শিরোনাম হয়েছে। পরের বছর আবার তিনি ফাইনালের প্রধান অতিথি। আবার সেই এক ভাষণ।

হঠাৎ কলকাতার বুক থেকে হকি হারিয়ে গেল কেন? শুধু কলকাতা কেন, হকিকে ঘিরে ভারতের যে একচেটিয়া দাপট, তাও যেন এখন নিছক রূপকথা মনে হয়। অলিম্পিকে আটবার সোনা এসেছে এই হকি থেকেই। কিন্তু শেষ সোনা এসেছে সেই ৪৫ বছর আগে। আবার সেই প্রশ্ন, ভারতই বা হকির শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই থেকে এতখানি পিছিয়ে পড়ল কেন?

হকির প্রাক্তনরা একটা ব্যাখ্যাই দিয়ে থাকেন, যখন থেকে অ্যাস্ট্রো টার্ফে হকির শুরু, তখন থেকেই ভারত যেন মূলস্রোত থেকে হারিয়ে গেল। অন্যান্য দেশ যখন ঘাসের মাঠকে বিদায় জানিয়ে একের পর এক অ্যাস্ট্রো টার্ফ বানিয়ে ফেলল, আমরা তখন অনেক পিছিয়ে। গত দুই-তিন দশকে দেশের নানা প্রান্তে অ্যাস্ট্রো টার্ফ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আমাদের রাজ্যে এতদিন একটিই অ্যাস্ট্রো টার্ফ ছিল। সল্টলেক সাই সেন্টারে। হকির জন্য আলাদা মাঠ ছিল না।

পড়শি রাজ্য ওড়িশা হকি ইন্ডিয়ার স্পনসর। সেখানে হকির বিশ্বকাপ হয়ে গেল। হকির পরিকাঠামোকে তারা কোথায় নিয়ে গেল। আর আমরা পড়ে রইলাম সেই তিমিরেই। গত কয়েকমাসে যেন ছবিটা অনেকটা বদলে গেল। ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে বসল আধুনিক অ্যাস্ট্রো টার্ফ। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল লড়াইকে ঘিরে আবার যেন হারানো দিন ফিরে পেল কল্লোলিনী তিলোত্তমা। প্রথমে গ্রুপ লিগে, পরে ফাইনালে। আবার শিরোনামে উঠে এল হকি। যুবভারতী সংলগ্ন মাঠেও বসছে আরও একটি অ্যাস্ট্রো টার্ফ। সেখানে থাকবে নৈশালোকের ব্যবস্থাও। অর্থাৎ, সামনের বছর থেকে হকির কলকাতা লিগ হবে নৈশালোকে। নিশ্চিতভাবেই আকর্ষণ আরও বাড়বে।

লেখার শুরুটাই হয়েছে সমালোচনা দিয়ে। বছরের পর বছর সরকারের প্রতিশ্রুতির ফানুস নিয়ে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে দুটো হকির মাঠ যদি তৈরি হয়, তার কৃতিত্বও সরকারের প্রাপ্য। যা দশ বছর আগে হতে পারত, তা না হয় দশ বছর পরেই হল। অবশ্য এই বিলম্বের দায় বাম সরকারেরও। দুই দশক আগেই রবীন্দ্র সরোবরে অ্যাস্ট্রো টার্ফের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সুভাষ চক্রবর্তী উঠেপড়েই লেগেছিলেন। কিন্তু ময়দানের একাংশের বিরোধিতায় তা শেষমেশ বাস্তবায়িত হয়নি।

একটা অ্যাস্ট্রো টার্ফের কতই বা খরচ! তার জন্য শুধু সাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে কেন? একটা অ্যাস্ট্রো টার্ফ কতখানি উন্মাদনা ফিরিয়ে দিল, তা তো চোখের সামনেই দেখা গেল। ক্লাবগুলিও দল গঠনে এগিয়ে এসেছে। এবারের উন্মাদনায় তাদের উৎসাহ আরও বাড়বে। নতুন দল যেমন আসবে, তেমনই স্পনসরও আসবে। আমাদের শহরের বুক থেকে অনেককিছু যেমন হারিয়ে যাচ্ছে, তেমনই আবার অনেককিছু ফিরেও আসছে। এই শহর আইপিএল দেখেছে, আইএসএল দেখেছে। এবার হকিকে ঘিরেও মেতে উঠুক কল্লোলিনী তিলোত্তমা।

কলকাতার আবেগকে স্পর্শ করতেই পারেনি কেকেআর

অজয় নন্দী

গতবছর ঝড়বৃষ্টির সেই রাত। সুদূর হায়দরাবাদে আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নাইট রাইডার্স। বঙ্গবাসী সেদিন চিন্তিত ছিল ঝড় বৃষ্টি নেই। কারা আইপিএলে জিতল, তা নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। বাংলা চ্যানেলগুলিও ঝড় জলের কভারেজেই ব্যস্ত ছিল। সেখানেও নাইট রাইডার্সকে নিয়ে কোনও উন্মাদনা চোখে পড়েনি।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে কলকাতাবাসীর আবেগ কতটা জড়িয়ে আছে? আমার মনে হয়, কলকাতার আবেগের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি নাইট রাইডার্স। এখনও মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলকে ঘিরে যে আবেগ, তার ছিটেফোটাও দেখা যায় না নাইট রাইডার্সকে ঘিরে। এর জন্য নাইট কর্তারা নিজেরাও দায়ী। বাংলা ও বাঙালির আবেগকে কখনই তারা সেভাবে মর্যাদা দেয়নি। যখন আইপিএল চালু হল, তখন এই দলটার প্রতি একটা আবেগ ছিল। তার বড় একটা কারণ সৌরভ গাঙ্গুলি। তাছাড়া সৌরভ অধিনায়ক থাকায় বেশ কয়েকজন বাঙালি ক্রিকেটারও ছিলেন নাইট শিবিরে। কিন্তু দ্বিতীয় বছর থেকেই শুরু হল ঘৃণ্য এক চক্রান্ত। সেবার ভোটের জন্য আইপিএল উড়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকায়। এই সুযোগ। জন বুকাননকে সামনে রেখে সৌরভকে ফের কোণঠাসা করার চেষ্টা। আর তাতেই সিলমোহর শাহরুখ খানের। তিন বছর পর সৌরভকে কিনা নিজের দলে ব্রাত্য হয়ে আশ্রয় নিতে হল পুনেতে! কলকাতার দল, অথচ সৌরভ ব্রাত্য! বিষয়টা মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। কেন জানি না, তখন থেকেই নাইট শিবিরের প্রতি সেই টান আর অনুভব করি না। দলের নামের সঙ্গে যতই ‘কলকাতা’ শব্দটা জড়িয়ে থাক, রাজস্থান, পাঞ্জাব বা হায়দরাবাদ যা, নাইট রাইডার্সও তাই।

তাই এই নাইট রাইডার্স তিনবার চ্যাম্পিয়ন হলেও বাড়তি কোনও আনন্দ বা আবেগ কাজ করেনি। আমার মতো অনেকের মনেই যে

প্রতিভা অন্বেষণ হবে। ১৭ বছর হয়ে গেল, একই ভাঙা রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। অথচ, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। এই দলের সঙ্গে একাত্মতা তৈরি হবে কী করে? আরও বেশি করে প্রমাণ পাওয়া গেল ইডেনে, এবারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচে।

একে উদ্বোধনী ম্যাচ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আকর্ষণ। তার ওপর উল্টোদিকে বিরাট কোহলি। স্বভাবতই গ্যালারি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। অনেকেই নাইটের জার্সি পরে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের গলায় চিৎকার শোনা গেল, কো-হ-লি, কো-হ-লি। বিরাট একটি করে চার মারছেন, নাইটের পরাজয় তত নিশ্চিত হচ্ছে। ইডেন যেন ততই হাততালিতে মুখর হয়ে উঠছে। অর্থাৎ, কেকেআর হারছে, তাতে কোনও দুঃখ নেই। কোহলি চার মারছেন, এতেই যত আনন্দ। এমনকী যাঁদের গায়ে নাইট রাইডার্সের জার্সি, তাঁরাও কোহলির জন্যই গলা ফাটাচ্ছেন।

এই ব্যাপারে উদাসীন, তা ক্রমশ টের পেয়েছি। মনে আছে, একবার কলকাতা বনাম পুনে। সৌরভ খেলছিলেন পুনের হয়ে। ইডেনের গ্যালারি সেদিন সৌচ্চার হয়েছিল সৌরভের জন্য। ইডেন সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল, সে নাইটের সঙ্গে নেই, আছে ঘরের ছেলের সঙ্গে। নাইট আর বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনা যেন সমার্থক। বাংলা ছেলেরাই অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে দাপটের সঙ্গে খেলছেন। অথচ, নাইট তাদের দলের নেওয়ার কথা ভাবেনি। ঋদ্ধিমান সাহা বরাবর খেলে গেছেন অন্য দলের হয়ে। নিলামে কখনও তাঁকে নেয়নি কেকেআর। ঈশান পোড়েল, অভিষেক পোড়েলের মতো ক্রিকেটাররা খেলছেন ভিনরাজ্যের হয়ে। এমনকী রনজিতে বাংলার হয়ে খেলা মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার, আবেশ খানদেরও কখনও দলে নেওয়ার কথা ভাবেনি কেকেআর।

শাহরুখ বারবার বলে গেছেন, এখানে অ্যাকাডেমি হবে, আলাদা স্টেডিয়াম হবে,

আমিও সেদিন মাঠে ছিলাম। কলকাতা হারার জন্য কারও মনেই কোনও দুঃখ দেখলাম না। বরং, কোহলি রান পেয়েছেন, এতেই সবাই খুশি। সবাই মনে করছেন, টিকিট কেটে মাঠে আসা সার্থক। আরও একবার বোঝা গেল, কলকাতার মানুষ নাইট রাইডার্সকে এখনও মন থেকে গ্রহণ করেনি।

সরাসরি বিমান! লগ্নি আসার মতোই অলীক কল্পনা

অজয় কুমার

কলকাতা থেকে লন্ডন যাওয়ার কোনও বিমান নেই! এমন একটা তথ্যের কথা অনেকেই হয়তো জানেন না। আপনাকে লন্ডন যেতে হলে আগে দিল্লি বা মুম্বই যেতে হবে। নইলে আপনাকে যেতে হবে দুবাই হয়ে। এমনকী পড়শি দেশ বাংলাদেশ থেকেও আপনি লন্ডনের বিমান ধরতে পারেন। কিন্তু কলকাতা থেকে ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় উড়ে যাবেন, তার উপায় নেই।

মুখ্যমন্ত্রী লন্ডনে গেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি আবেদন করেছেন, কলকাতা থেকে যেন লন্ডনের সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু হয়। তিনি আবেদন করতেই পারেন। কিন্তু তাতে বিমান চালু হয়ে যাবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আসল কারণটা হল অর্থনৈতিক। এই রুটে বিমান চলাচল লাভজনক হলে এভাবে আবেদন জানাতেই হত না। তাঁরা নিজেদের গরজেই বিমান চালাতেন।

কলকাতা থেকে লন্ডনে কোনও কালেই কি বিমান ছিল না? অবশ্যই ছিল। ইংল্যান্ডের বিমানও ছিল, আমেরিকার বিমানও ছিল। কিন্তু দৈনিক চালালে তা লাভজনক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাই সপ্তাহে তিন দিন চলত। কিন্তু দেখা যায়, তাতেও বিজনেস ক্লাসে পর্যাপ্ত যাত্রী হচ্ছে না। ফলে, বাধ্য হলেই ব্রিটিশ বিমান সংস্থা কলকাতার বিমান চলাচলে পাততাড়ি গুটিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ না হয় বিমান চালাচ্ছে না। কিন্তু এয়ার ইন্ডিয়া বা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান তো লন্ডন যেতে পারত। তারাই বা চালায় না কেন? কারণ, তাঁরাও বোঝেন, কলকাতা থেকে লন্ডন বা আমেরিকার বিমান চালিয়ে লাভ তো দূরের কথা, মোটা অঙ্কের লোকসান অপেক্ষা করছে। সহজ কথা, আমাদের রাজ্যের শিল্পপতিদের সেই ক্রয়ক্ষমতা নেই। বা ইংল্যান্ড, আমেরিকা থেকে এই শহরে সেই পরিমাণ লোকের আনাগোনা নেই। যাঁরা আছেন, ঘুরপথেই তাঁদের আসতে হবে।

একটা রাজ্য বা সেই রাজ্যের একটা শহর কতটা শিল্পোন্নত, অর্থনৈতিকভাবে কতটা সমৃদ্ধ, তা বোঝা যায় সেই শহর থেকে লন্ডন বা আমেরিকার ডাইরেক্ট বিমান আছে কিনা। না থাকলে বুঝতে হবে, সরকার যতই সাফল্যের ঢাক পেটাক, বাস্তব ছবিটা অন্যরকম।

সরাসরি বিমান নেই, এটা এতদিন আমজনতা সেভাবে জানতেনও না। জানার দরকারও পড়েনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর লন্ডন সফর এই বিষয়টাকে আরও সামনে এনে দিল। সফরসঙ্গী সাংবাদিকরা একটু বাড়তি আপ্লুত হবেন, সেটাই স্বাভাবিক। তাঁদের লেখা পড়লে মনে হবে, লন্ডনের বিমান এই চালু হল বলে! যেমন, প্রতিবার শিল্প সম্মেলনের পর মনে হয়, এই বুঝি শিল্পের বন্যা বয়ে যাবে! আগেও বারবার যেমন হতাশ হতে হয়েছে, এবারও সেই হতাশাই ভবিতব্য।

আহারে বাহারে

বিভূতিভূষণ এখানে কখনও খেতে আসেননি

দিব্যেন্দু দে

একেবারেই সাম্প্রতিক একটি ওয়েব সিরিজ— রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনও খেতে আসেননি। পূর্ববঙ্গের একটি হোটেলের পটভূমি। সেই ভাতের হোটেলকে ঘিরে নানা ওঠা-পড়া। কিন্তু নামকরণেই রয়েছে অদ্ভুত এক চমক।

তেমনই একটি হোটেলের কথা। রানাঘাটের আদর্শ হিন্দু হোটেল। রানাঘাট স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বাইরে বেরিয়েই চোখে পড়বে এই হোটেলটি। মনে পড়ে যাবে বিভূতিভষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। এই রানাঘাট স্টেশন সংলগ্ন একটি ভাতের হোটেলকে নিয়ে লেখা তাঁর কালজয়ী উপন্যাস— আদর্শ হিন্দু হোটেল। সেই হাজারি ঠাকুর। সেই পদ্ম ঝি। আরও কত চরিত্র। যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আটের দশকের শেষদিকে চমৎকার একটা সিরিয়ালও হয়েছিল। মনোজ

মিত্র, সাবিত্রী চ্যাটার্জির সেই অভিনয়ের কথা এখনও মুখে মুখে ফেরে।

অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল এই হোটেলে একদিন খাওয়ার। কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে, একদিন সুযোগটা এসেই গেল। গিয়েছিলাম কৃষ্ণনগর। ফেরার পথে কী মনে হল, নেমে পড়লাম রানাঘাটে। অন্য কোনও কারণে নয়। স্রেফ ওই হোটেলে একদিন খাব বলেই। এই হোটেলকে নিয়ে এমন কালজয়ী উপন্যাস! মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা শিহরণ কাজ করছিল। দোকানে বেশ ভিড় ছিল। ফলে, শুরুতে মালিকের সঙ্গে বা কর্মীদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলার তেমন সুযোগ ছিল না। এত খদ্দেরের ভিড়ে দোকানের ইতিহাসের কথা বলতে হলে তাঁরা হয়ত বিরক্তই হতেন। সত্যিই তো, একই ইতিহাস কতবারই বা বলবেন!

নীচে এখন একটা মিষ্টির দোকান। নাম আদর্শ সুইটস। পাশ দিয়ে গেছে সরু সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয় দো’তলায়। বেশ ছিমছাম, সাজানো। বিভূতিবাবুর ছবি টাঙানো। এখান থেকে স্টেশন দেখা যায়। ট্রেনের আসা –যাওয়াও দেখা যায়। বিভূতিবাবুর ভাবনায় নিশ্চয় এমন দোতলা ছিল না। সেখানে ছিল দরমার বেড়া। খড়ের ছাউনি। কলাপাতা। স্টেশন থেকে খদ্দের ডেকে আনতে হত। হাজারি ঠাকুরের রান্নার এমনই সুখ্যাতি, খদ্দেররা ঠিক ভিড় জমাত।

কিন্তু যা হয়! লোকের অধীনে কাজ করতে গিয়ে নানান সমস্যা। এমনকী চুরির অপবাদও মাথায় নিতে হল। হাজারি ঠাকুরের অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল নিজের একটা হোটেল তৈরি করবেন। সেখানে নিজের হাতে রান্না করে খদ্দেরদের খাওয়াবেন। কোনও খদ্দেরকে ঠকাবেন না। কিন্তু তাঁর সেই সামর্থ্য কই? এদিক–ওদিক থেকে টাকার জোগাড় হয়ে গেল। স্টেশনের গায়েই তৈরি হল আদর্শ হিন্দু হোটেল। মালিক হওয়া সত্ত্বেও ক্যাশবাক্স নয়, তাঁর ঠিকানা সেই রান্নাঘর।

আমি কোনওকালেই রাঁধুনি নই। চা, চাউমিন, কাজ চালানো খিচুড়ি, ডিম ভাজা— এই আমার রান্নার দৌড়। বেশি সময়ও নেই, সেই নিষ্ঠাও নেই। কিন্তু নিজের কাজটা বরাবরই যত্ন নিয়ে করি। তাই হাজারি ঠাকুরের সঙ্গে নিজের কোথায় একটা মিল পেতাম। সেই কারণেই হয়ত এই উপন্যাসটা আমার এত প্রিয়। সেই কারণেই রানাঘাটের এই হোটেলে একদিন

ভাত খাওয়ার এমন তীব্র ইচ্ছে।

দোকানে একইসঙ্গে ঐহিত্য আর আধুনিকতার মিশেল। দিনের বেলায় এখনও সেই সাবেকি ভাতের হোটেল। কলাপাতা নেই, তবে কাগজের প্লেটে কলাপাতার আদল আছে। ভাত, ডাল, নানা রকমের তরকারি, ভাজাভুজি। পাঁঠার মাংস। সঙ্গে নানা রকমের মাছ। তবে সন্ধের পর চেহারা অন্য-রকম। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তখন মোগলাই, চাইনিজের হরেক আয়োজন। দাম যে খুব বেশি, তাও নয়। মোটামুটি অন্যান্য রেস্তোরাঁর মতোই।

আচ্ছা, হাজারি ঠাকুর থাকলেও কি আজ এভাবেই চাইনিজ, মোগলাই করতেন? হয়ত করতেন। কারণ, উপন্যাস পড়ে যেটুকু মনে হয়েছে, তিনি সময়ের দাবি বুঝতেন। খদ্দেরের চাহিদা ও তৃপ্তির কথা বুঝতেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই ভালবাসতেন। তাই তিনিও হয়ত চাইনিজ, মোগলাই আয়ত্ব করে নিতেন। ভাত, ডাল, মুড়ি ঘণ্টের সঙ্গে যখন সর্ষে ইলিশ দিয়ে গেল, মনে হচ্ছিল ভেতরে বোধ হয় সেই হাজারি চক্কোত্তি মশাই রান্না করছেন।

না, বিভূতিবাবুর সময় সত্যিই এই হোটেল ছিল না। তবে এই বাড়ির সঙ্গে

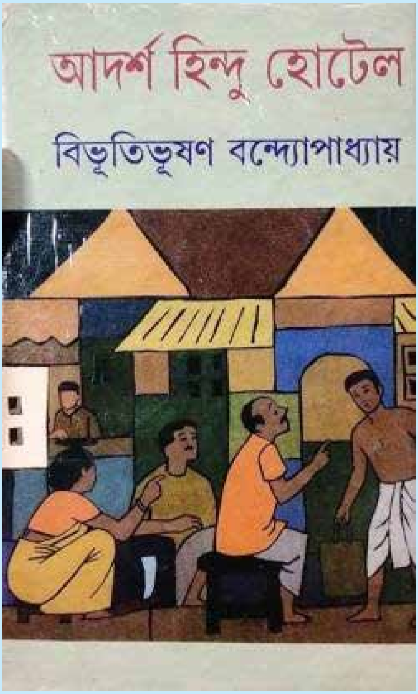

তাঁর একটা নিবিঢ় সম্পর্ক ছিল। এটা ছিল তাঁর মাসির বাড়ি। মাঝে মাঝেই পথের পাঁচালির স্রষ্টা এই বাড়িতে আসতেন। থাকতেন। কখনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে লোকজনের আসা যাওয়া দেখতেন। আবার কখনও হেঁটে হেঁটে চলে যেতেন চূর্ণী নদীর দিকে। আশপাশের কিছু হোটেল হয়ত দেখেওছিলেন। মনে মনে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল এই কালজয়ী উন্যাস।

এই দোকানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই গোপীনাথ কুণ্ডু অবশ্য প্রথমে উপন্যাস

পড়েননি। বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পর এই উপন্যাস নিয়ে একটি নাটক হয়েছিল। কলকাতায় একবার সেই নাটকটি দেখেন। তখনই নামটি মাথায় গেঁথে যায়— আদর্শ হিন্দু হোটেল। এখন যেখানে, সেখানে নয়, এখান থেকে একটু দূরে। তখন ছিল মাটিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। পরে বিভূতি বাবুর স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়িটা কিনে নিলেন। এখানেই উঠে এল আদর্শ হিন্দু হোটেল। অনেকেই ভাবতেন, এই হোটেলেই হয়ত বিভূতিভষণ খেতেন। বা এই হোটেলকে ঘিরেই তিনি হয়ত ওই উপন্যাস খানা লিখেছেন। কিন্তু আসল সত্যিটা হল, উপন্যাসটা লেখার পর, বিশেষত সেটা নাটক হওয়ার পর, এই নামের হোটেলটি তৈরি হয়। পরে আটের দশকে এই কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয় সিরিয়াল হয়। ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় আদর্শ হিন্দু হোটেলের কথা।

আশপাশের অনেকেই তখন এখানে খেতে আসতেন। যেমন এখনও আসেন। আর যেহেতু বাইরে থেকে এত খদ্দের স্রেফ এই নামটার জন্যই আসে, তাই মানটাও ধরে রাখতে হয়েছে। হাজারি চক্কোত্তির মতো না হোক, অন্তত ভাল মানের রাঁধুনি রাখতে হয়েছে। তাই ভাত –ডালের হোটেলে সীমাবদ্ধ না থেকে চাইনিজ–মোগলাইয়ের আমদানি করতে হয়েছে।

গোপীনাথবাবু নেই। তাঁর ছেলে অমরনাথ কুণ্ডু এখন ক্যাশবাক্সে বসেন। চাইলে একটু জল মেশাতেই পারতেন। বলতেই পারতেন, এখানে বিভূতিভূষণ খেতেন। কিন্তু তিনি সত্যিটাই বলেন। তিনি অকপটেই বলেন, 'বিভূতিবাবু এই হোটেল দেখে যাননি। তখন এই হোটেল ছিলও না। তাঁর এই উপন্যাসের নাম অনুসারে আমার বাবা এই হোটেল তৈরি করেন।' চারিদিকে যখন বাড়িয়ে বলার হিড়িক, তখন ষাট বছরে একটু জল মেশাতেই পারতেন। কোথাও একটা সংযম ধরে রেখেছেন। জানেন, কতটুকু বলতে হয়। কোনটা বলতে নেই। এই সংযমটা কজনের থাকে!

বিভূতিভূষণ আসুন আর নাই আসুন, এই নামটার একটা বাড়তি আকর্ষণ তো আছেই। এই বাংলায় এমন নামের হোটেলের অভাব নেই। সব জেলাতেই পাবেন। কিন্তু রানাঘাট স্টেশনের বাইরেই। সেই বাড়িতেই। আশপাশের অনেক ছবিও দিব্যি মিলে যায়। সাহিত্যের একটা গন্ধ তো আছেই। আমিও তো গিয়েছিলাম সেই গন্ধের টানেই।

আহারে বাহারে

বেঙ্গল টাইমসের জনপ্রিয় বিভাগ— আহারে বাহারে। এই বিভাগে থাকবে বিভিন্ন হেরিটেজ হোটেল, রেস্তোরাঁ বা খাবারের কথা। সেটা রেস্তোরাঁ না হয়ে চা, সরবত বা মিষ্টির দোকানও হতে পারে।

কলকাতার নানা প্রান্তে এমন কত দোকান ছড়িয়ে আছে। জেলায় জেলায় এমন কত প্রাচীন দোকান ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসের গন্ধ মাখা সেইসব দোকান বা খাবারের কথা আপনিও লিখতে পারেন। সেই দোকানের ঐতিহ্যের পাশাপাশি মিশে থাকুক আপনার অনুভূতিও। লেখার সঙ্গে ছবিও পাঠাতে পারেন।

লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

অন্ধকার নির্জন রাতে খোলা জিপ থেকে সেই বাঘের গর্জন

কুমকুম বসু দাস

বেড়ানো বলতে নির্দিষ্ট কোনও ট্যুরিষ্ট স্পটের কথা বলছি না। এ একেবারেই অন্যরকম ভ্রমণ আর সেই সুবাদে বাঘ-মামার দর্শনলাভ।

আমার স্বামী ছিলেন ভূতাত্ত্বিক। ভ্রাম্যমাণ কর্মজীবনে তাঁকে থাকতে হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের গভীর অরণ্য, দুর্গম পাহাড় আর উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে। সেই সুবাদে আমারও এইসব জায়গায় থাকার ও ঘোরার সুযোগ হয়েছে। তাই আমার লেখনীতে এরা ধরা দিয়েছে বারবার। কতরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তখন তাঁর পোষ্টিং ছিল হায়দরাবাদে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ইষ্ট কোষ্ট বক্সাইট প্রজেক্টের জন্য পূর্বঘাট পর্বত মালার প্রত্যন্ত গ্রাম চিন্তাপল্লীর বেস ক্যাম্পে যেতে হবে ক্যাম্প ইনচার্জ হয়ে। লঙ জিপ জার্নি। ভোরবেলা হায়দরাবাদ থেকে রওনা হলাম। ভাইজ্যাক হয়ে সিকাকুলমের পথ ধরে এগোতে থাকলাম পূর্বঘাট পর্বতমালার অরণ্যপথে।

পাহাড়ের বুক চেরা আঁকা বাঁকা (হেয়া-রপিন বেন্ট), মায়াবী পথ ধরে এগিয়ে চলেছে জিপ। জঙ্গলের নিজস্ব এক অদ্ভুত মাতাল করা সোঁদা গন্ধ আসছে।

সূর্যের আলো এ পথে আসতে পারে না সরাসরি। গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিলমিল কাটে; আলো আঁধারীর একটা অদ্ভুত লুকোচুরি চলে। পথের ধারে বানরের দল কিচমিচ করে। অরণ্যের নির্বাক নৈশব্দের মধ্যে ছোটছোট ঝর্ণার কল-ধ্বনি। মাঝে মাঝে কোনও গ্রামবাসী কাঠের বোঝা বা জলপূর্ণ কলস নিয়ে স্বচ্ছন্দে উঠে যাচ্ছে। প্রাণভরে অনুভব করছি এই সৌন্দর্য।

হঠাৎ জিপ থেমে গেল। সামনে কী যেন পড়ে। পথ বন্ধ। উল্টো দিক থেকে আসা একটা ট্রাকও থেমে গেছে। জিপ থেকে নেমে দেখি একটা প্রায় সাতফুট লম্বা পাইথন পড়ে আছে। এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে ঢোকার জন্য হয়ত পথ পারাপার হচ্ছিল। রাতের অন্ধকা-রে কোনও ট্রাক এসে পিষে দিয়ে গেছে। আমাদের ড্রাইভার একটা বড় রড দিয়ে তাকে পথের ধারে সরিয়ে দিল। আবার চলা শুরু।

সূর্য ঢলে পড়ছে। হলুদ কমলা রঙের বিশাল ক্যানভাসে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। দুকিলো মিটারের মধ্যে একটি স্যাটেলাইট ক্যাম্প ছিল। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ হল্ট করলাম। একজন সার্ভেয়ার ছিলেন। তিনি আমাদের রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে যেত বললেন। কিন্তু আমার স্বামী সেদিনই বেস ক্যাম্পে পৌঁছতে চাইলেন।

অন্ধকারের বুক চিরে জিপ চলেছে। কোথাও কোনও আলো নেই। আলো বলতে শুধু জিপের হেডলাইট। আর জোনাকির আলোর মালা। চোখ একটু তন্দ্রা জড়িয়ে ধরেছিল। হঠাৎ মাত্র একশো গজ দুরত্বের মধ্যে শুনতে পেলাম এক হাড় হিমকরা হুঙ্কার। হ্যাঁ, বাঘের গর্জন। সে ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছিল। চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখেছি। সিনেমাতেও দেখেছি। গর্জনটা মোটামুটি পরিচিত। তার ওপর রাতের অন্ধকারে নির্জন রাস্তায় যদি এমন গর্জন ভেসে আসে, তাহলে তো কথাই নেই।
ড্রাইভার হায়দার আলি চিৎকার করে উঠল—শের নিকলা। ভয়ে গাড়িতে ব্রেক দিল। সেই সময় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকা মানে যে কোনও সময় বাঘ হামলা

করতে পারে। আমার স্বামী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হায়দারকে পিছনের সিটে পঠিয়ে ইঞ্জিন অন করে দ্রুত বেগে জিপ চালিয়ে দিলেন। পাশেই নালা ছিল। মনে হয় জল খেতে এসেছিল। জিপের শব্দ আর আলো হয়ত তাকে বিচলিত করেছিল। তাই এই হুঙ্কার।

খোলা জিপ থেকে এমন মুক্ত বাঘের দেখা পাওয়া অনেকের কাছেই হয়ত সৌভাগ্যের মনে হতে পারে। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে আমাদের মনের অবস্থা কী ছিল, তা শুধু আমরাই জানি।

সেদিন বাকি পথটুকু কেটেছিল রুদ্ধশ্বাসে। যখন বেস ক্যাম্পে পৌঁছলাম তখন রাত এগারোটা। ওয়াচ ম্যানরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হার্ট-মেন্টে জিনিস পত্র গুছিয়ে দিল। এন টেন্টে হাতমুখ ধুতে ঢুকেছি। হাতে হ্যারিকেন। মনে হল, বালতিটা অস-ম্ভব ঠান্ডা। কী যেন নড়ে উঠল। ছুটে টেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। চিৎকার করে ডাকলাম সকলকে।

ওয়াচম্যান টেন্টের ভেতরে ঢুকে ‘নাগ পামু’ ‘নাগ পামু’, বলে চেচামেচি করতে লাগলো। তেলেগু ভাষায় এর অর্থ গোখরো সাপ। চিন্তাপল্লী ছিল গোখরো সাপ অধ্যুষিত। ক্যাম্পে আরও দুজন জিওলজিষ্ট ছিলেন। তাঁদের কাছে রাতের খাবার খেয়ে হার্টমেন্টের সামনে বসলাম চেয়ার পেতে। ওয়াচম্যানরা ক্যাম্প ঘিরে ধঙনি জ্বালাতে ব্যস্ত। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারিদিক। সে জ্যোৎস্না কৃপণ নয়। সারা বনভূমিকে রুপোর পাতে মুড়ে দিয়েছে। হেমন্তের হিমেল হাওয়ায় শান্তির আশ্বাস।

ভ্রমণ

পলাতক হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা

শান্তনু দেশাই

ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ঝমঝম করে একটা ব্রিজ পেরোলো ট্রেনটা। নদীর নাম দেখলাম ডায়না। ভারী সুন্দর তার গড়ন। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ গো তুমি বিদেশি নাকি? কলকলিয়ে হেসে বললো কেন গো? নদীর আবার দেশ বিদেশ হয় নাকি?

আমাদের তো সারা বিশ্ব এক দেশ। সকলেই আমরা কারো না কারোর সঙ্গে জড়িয়ে আছি। তোমরা নিজেদের মত করে ভাগ করে নিয়েছ।

লজ্জায় পড়ে গেলাম। সত্যি তো আমরাই বিশ্বকে বিভাজিত করেছি।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল কিছুক্ষণ। ভালোই হোল। আমি ডায়নার সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার সুযোগ পেলাম। ডায়না, তিস্তা, তোর্ষার খোঁজ নিল। আমাকে সুধালো কোথায় যাচ্ছি।

বললাম কোথাও নয় গো। এমনি অলস ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ডায়না বললো, ও, পলাতক ছবির রেশ নাকি !

নাঃ, সে আর পারি কই।

ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে দুলে উঠল। ডায়না কে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম। জানালার বাইরে সরে সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট। আমার কল্প জগৎ সারাক্ষণ অনুরিত হচ্ছে সেই চলমান দৃশ্যের।

আমি একটু বেশিই কল্পনা প্রবণ।

কৈশোর বয়সেও সাহিত্য পরীক্ষায় বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, নিয়মানুবর্তিতা, বা

কোনও মনীষীদের অবদান রচনা ছেড়ে আমি একদম শেষে থাকা একটি বট গাছের আত্মকথা বা একটি নদীর আত্মকথা লিখতে পছন্দ করতাম।
কলেজে নীরস লেকচারের ফাঁকে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের ঘুরপাক খেয়ে ওঠা ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে বিভোর হয়ে যেতাম।
সেই কল্পনার কলতান ইদানিং একটু কমেছে সাংসারিক চাপের কারণে। মনের চাতালে শ্যাওলা জমেছে।
তবু আজও সুযোগ পেলেই মন উড়ি উড়ি।
ট্রেনের আরামপ্রদ চেয়ারে প্রায় সকলেই মুঠো ফোনে মগ্ন। জানি না কি দেখেন, শোনেন। ট্রেনের জানালার বাইরে তখন একটা ছোট্ট গ্রাম। অনেক সুপারি গাছ, দরমার বেড়া দেয়া গোয়ালঘর। টিনের চালা দেয়া দু কামরার ঘর থেকে ধোঁয়া উঠছে। হয়তো কেউ কাচি মাছের বাটি চচ্চড়ি বসিয়েছে। ঝাল ঝাল কুল লঙ্কা দিয়ে সে বড় লোভনীয়।
বেশ কদিন ধরেই এদিকে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। খাল বিল গুলো ভর ভর। তাতে কয়েকজন বাঁশের ঘনি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায়। আনারস ক্ষেতে জল ঢুকেছে। একটা মন্দির জেগে আছে। তার চাতালে দুইজন বসে।
ভাবি ওরা কি নিয়ে কথা বলছে।
ডবল ডোজ, বুস্টার, নিউ ভ্যারিয়েন্ট এইসব শব্দ কি ওদের জানা?
সেভক স্টেশন এ বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে।
আমাদের শহুরে স্বাচ্ছন্দের বলি কয়েক হাজার গাছ।
শুধুই কি গাছ? তাতে থাকা কত পতঙ্গ, পাখি ? ওরা কোথায় যাবে ?
কতদিন জোনাকি দেখিনা।
রাঙারুনে হোম স্টের বারান্দায় বসে দূরে আলোকমালায় সজ্জিত দার্জিলিং শহরকে দেখে জোনাকি দেখার স্বাদ মেটাই।
আমরা খুব হিংস্র।
ভাবনায় ছেদ পড়ে হকারের ঝালমুড়ির আওয়াজে। কি সুন্দর সাজানো।
কিন্তু আমি যে সব কিছু সাজানো পছন্দ করিনা। একটু অগোছালো থাকাও ভালো।
সাজানোর সুযোগ থাকবে তো।

এই দেখোনা সাজানো কাশ্মীর ভ্রমণ করতে গিয়ে মনটা একদম অগোছালো হয়ে গেল।
হৈ হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি করে বেহাল।
অশান্ত মনকে শান্তি দিতে তিনদিনের ছুটিতে চলে এলাম বর্ষার দার্জিলিংয়ে।
কোনও তাড়াহুড়ো নেই, কোলাহল নেই।
টিপটিপ বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় অলসভাবে লেবঙ কার্ট রোড, ভুটিয়া বস্তি, মহাকাল মন্দির ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।
চাইনি তবু সে দেখা দিল।
গুনগুন করে গান শোনালাম... আমি আপন করিয়া চাহিনি তোমারে, তুমি তো আপন হয়েছো।
লাজুক হেসে মেঘের চাদরে ঘোমটা দিল।
এই বেশ।
রোহিনীর রাস্তা ধরে শেয়ার জিপে যখন আসছিলাম তখনই চোখে সবুজের আস্ত-রণ ঘন হয়ে লেপ্টে গিয়েছিল।
জোড় বাংলো নেমে উল্টোদিকের রাস্তা ধরে তিন মাইল এসে যখন রাঙ্গারুন এর রাস্তা ধরলাম সে সবুজ আপ্লুত করে দিল।
কোথাও ঈষৎ হলুদাভ, কোথাও গাড় সবুজের শেড। জনমনিষ্যির চিহ্ন মাত্র নেই সারা রাস্তা জুড়ে।
ট্রেকার্স হাট, খালিঙ্গ হোম স্টে পেরিয়ে আশ্রয় নিলাম নিলম হোম স্টে তে।
ছোট্ট ছিমছাম ঘর বারান্দা। রাঙারুন এর চা বাগান এই অঞ্চলের সবথেকে প্রাচীন।
দুঃখের বিষয় চা কারখানা টি বন্ধ। পূর্বের শ্রমিকরা কেউ দূরের বাগানে কাজ নিয়েছে, কেউ ঘরের সামনে দোকান করে দিন গুজরান করে।
পায়ে হেঁটে ঘুরতে বেশ লাগছিল।
কিছুটা দূরেই লাকপা হোম স্টে। সবথেকে সেরা লোকেশন। ঘর থেকেই চা বাগান সহ টাইগার হিল, দার্জিলিং শহর দৃশ্যমান।
গাঁয়ের নীচে নদী। অন্য সময় জল থাকেনা।
নদী পেরিয়ে পাহাড় চড়ে টি এন রোড ধরে দার্জিলিং যাওয়া যায়।
আমার সে আশায় জল ঢেলে দিল নদী। জল বিপদজনক ভাবে বয়ে চলেছে। পারাপার মুশকিল।
পরদিন রাঙারুন কে বিদায় জানিয়ে চলে এসেছিলাম দার্জিলিং।
আস্তাবল পেরিয়ে ম্যাল থেকে একশ মিটার দূরে সস্তার হোটেলে এক রাত কাটিয়ে নেমে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি।
ভবঘুরের মত ইচ্ছে নিয়ে কোনও গন্তব্য রাখলাম না। সকালের ট্রেন ধরে ডুয়ার্সের ঘন সবুজ গায়ে মেখে, চোখে লেপটে পৌছেছিলাম আলিপুরদুয়ার।
খানিক বিশ্রাম আর দুপুরের ভোজন সেরে ফিরতি পথে ডুয়ার্স রানী কাঞ্চন কন্যা ধরে বাড়ির পথে পা বাড়ানো।
রাজাভাতখাওয়া স্টেশন এর পাশে নুড়ি পাথরের খাঁজে অনেক অনেক প্রজাপতি উড়ছে, বসছে ঘুরছে। কিতাবি ভাষায় মাড পুডলিং বলে।
ওরা ডাক দিল, আসবে না?
বললাম, আসবো আর একদিন,
আজ যাই।

কুয়াশাঘেরা ছোট্ট গ্রাম পাবং

নূপুর রায়

কালিম্পং শহর থেকে মাত্র ২২ কিলোমিটার দূরে ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পাবং। গুটি কয়েক ঘর বাড়ি, একটা প্রাইমারি স্কুল, দু চারটে হোম স্টে, দুটো বিলাসবহুল ফার্ম হাউস। এ বাদে এখানে সত্যিই আর দেখার কিছুই নেই। তবে যা আছে তার হল অনাঘ্রাতা, অসামান্যা প্রকৃতি। চারিপাশে ঘিরে থাকা ন্যাওড়া ভ্যালির বিস্তীর্ণ জঙ্গল, কান পাতলেই ভেসে আসা পাখির কূজন আর মেঘের গায়ে লেগে থাকা বুনো ফুলের ঘ্রাণ। এমন একটা জায়গায় দু একদিন কাটিয়ে গেলে এমনিতেই মন ভাল হয়ে যায়।

কুয়াশার ওড়না জড়ানো নীলচে সবুজ পাহাড়, এলাচের ক্ষেত, ঝাড়ু গাছের ক্ষেত চিরে নিকষ কালো একটা পিচের রাস্তা পাকদণ্ডীর মতো উঠে গেছে একেবারে উপরে, ওই সবুজে মোড়া পাহাড়ের মাথায়। ওটাই হল চারখোল।

কালিম্পঙ থেকে পাবং আসার রাস্তাটাও অসাধারণ। মন কেড়ে নেওয়া একান্ত আপনজনের মতো। প্রতি মুহূর্তে ঘন সবুজ বর্ষণস্নাত প্রকৃতি দু'হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলে, এই তো এলে, একটু জিরিয়ে গেলে না হয়।

পথের সৌন্দর্য বড়িয়েছে দুই সহোদরা গ্রাম রেলি আর পলা আর তাদের নিজস্ব দুই নদী। ভরা বর্ষায় ঝমঝমিয়ে পাথর ডিঙিয়ে নেচে নেচে বয়ে চলেছে চপলা বালিকার মতো। খুব ইচ্ছে ছিল পা ডুবিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প করি। বলি, আসবো আবার। এই তো চিনে গেলাম।
 সে আর হয়ে ওঠেনি।

পাবংয়ে আমরা উঠলাম ভট্টরাই হোমস্টে তে।। সম্ভ্রান্ত নেপালী ব্রাহ্মণ পরিবারের নিজস্ব বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তিনটে ঘরেই পর্যটকদের থাকার

ব্যবস্থা। নিজস্ব ক্ষেত খামার, গোয়ালঘর, কাঠের দোতলা বসত বাড়ি, প্রশস্ত উঠান— সব মিলিয়ে খুব সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পুজো উপলক্ষে শহর থেকে আত্মীয় স্বজন এসেছেন। আর সঙ্গে যোগ দিয়েছি আমরা তিনজন। পুরো বাড়ি জুড়ে উৎসবের আমেজ। খুব সহজেই আমরা এবাড়ির সকলের সঙ্গে মিশে গেলাম।

বাধ সাধলো প্রকৃতি। আগের রাত থেকে যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে, এখানে এসে তা আরও প্রবল আকার ধারণ করল। টিপ টিপ, রিমঝিম, ঝমঝম কোনও উপমাতেই তাকে আর বেঁধে রাখা গেল না। ছোটবেলায় পরীক্ষায় খুব কমন একটা রচনা ছিল— 'একটি বর্ষণ মুখর দিনের অভিজ্ঞতা'। এর যথার্থতা জীবনের প্রথমবার মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করলাম। আর বৃষ্টি একটু ধরতেই ছাতা সম্বল করে সোজা গ্রামের পথে।

প্রকৃত অর্থে গ্রাম বলতে যা বোঝায় এখানে তার রূপ কিছুটা ভিন্ন। পাহাড়ের কোলে অনেক সময় ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে দেশলাই বাক্সের মতো হঠাৎ করে একটা একলা বাড়ি নজরে আসে। এই হোমস্টে-টা অনেকটা তেমনি। বেশ কিছুটা এলাচের ক্ষেত পেরিয়ে আসতে হয়। এরপর ইতস্তত কিছু ঘর বাড়ি, নতুন তৈরি হচ্ছে এমন কিছু হোমস্টে, আর তার পর একটা প্রাইমারি স্কুল। উপরে ওঠার পথে রয়েছে অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন কিছু ফার্ম স্টে। পাবং থেকে চার কিলোমিটার হেঁটে চারখোল গিয়ে ফিরে আসা যায়। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকায় আমরা সেভাবে যাইনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছোলাম প্রাইমারি স্কুলের প্রাঙ্গণে। সেখানেই দুর্গা পুজোর আয়োজন হয়েছে। সারা গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে। আমরাও সেই উৎসবে সামিল হলাম। পুজো শেষে প্রসাদ খেয়ে টিকা লাগিয়ে ফিরতে না ফিরতেই আবার আরেক প্রস্থ বৃষ্টি। তারপর এল সেই মায়াবী সন্ধে। একটা একটা করে দূরের পাহাড়ে জ্বলে উঠল আলো। বিন্দু বিন্দু সেই আলোগুলো জুড়ে গিয়ে তৈরি হল আলোর মালার। হিরের নেকলেসের মতো দ্যুতি ছড়ালো মেঘের গায়ে। এক সূতোয় বাঁধা পড়ল দূরপিন দাঁড়া, কালিম্পং, আলাগড়া থেকে সুদূর ভূটানের কিছু অংশ।

দূরের পাহাড়ের আলো দেখার সৌভাগ্য আগে হলেও, এত সুন্দর নির্দিষ্ট আকৃতি আগে কখনও দেখিনি। আবারও মুগ্ধ হলাম। কিছু মুহূর্ত লেন্সবন্দি হল। যা চর্মচক্ষে দেখতে পাইনি তা মানসচক্ষে কল্পনা করে নিলাম। আফসোস একটাই, আবহাওয়া ভাল থাকলে এ বাড়ির উঠান কিংবা জানালা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা- সহ হিমালয়ের একটা বিস্তৃত রেঞ্জ দেখা যায়। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাইনি।

খাওয়ার টেবিলে কথায় কথায় গল্প জমে উঠল। কার্শিয়াং থেকে এবাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে এসেছেন কাকু -কাকিমা। দু'জনই অধ্যাপক। ভাল বাংলা জানেন। ওনাদের কাছ থেকেই জানলাম পাহাড়ের শিক্ষা ব্যবস্থা, চাকরি-সহ বিভিন্ন সমস্যার কথা। জানলাম এই পাবং এর কথা। ১৯২০ সালে দূরপিন দাঁড়াতে আর্মি ক্যাম্প তৈরি হলে ওখানকার জনবসতিকে পাবং ও কাফের গাঁও তে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ওনারা সেই ভাবেই এখানে এসেছেন। কাকু নিজে হাতে নতুন স্বাদের খাসির মাংস রান্না করে খাওয়ালেন। এই মাংস দু'দিন ধরে সংরক্ষিত হয়েছে কাঠের উনুনের তাপে, ফলে একটা আনকমন ফ্লেভার ছিল। খাওয়ালেন নিজের হাতে তৈরি স্পেশাল পান, মিষ্টি আরও কতকিছু। বলাবাহুল্য, এগুলোর কোনওটাই আমাদের প্রাপ্য পরিষেবার আন্তর্ভূক্ত ছিল না। কিছু মানুষ এভাবেই মনের কাছাকাছি চলে আসেন। পরের দিন এই ভালোলাগাটুকু সঙ্গে নিয়েই চলে যাব চারখোল। ওখানেই কাটিয়ে আসব বাকি দুটো দিন।

বেঙ্গল টাইমস

৬ এপ্রিল, ২০২৫

- দুর্নীতির দায় বিরোধীদের!
- রামনবমীর এত হিড়িক কেন?
- কলকাতার হৃদয়ে নাইট ব্রাত্য
- যাই যাই বসন্তে উত্তরে

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in